Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
ISSN 2583-6706 (Online)
Volume-2 Issue-2 January 2024

রবীন্দ্র সাহিত্যে রোগ-ব্যাধি-মড়ক-মহামারী প্রসঙ্গ

সায়ন্তন মণ্ডল

Link : https://bit.ly/48AVwad

সারসংক্ষেপ : আমাদের চলার পথের নিত্য সঙ্গী রোগ-ব্যাধি-মড়ক-মহামারী। সংসারে নানা অভাব থাকলেও ম্যালেরিয়া-যক্ষা-বসন্ত-প্লেগ-কলেরা প্রভৃতির কোনো অভাব ছিল না, ভবিষ্যতেও থাকবে না। মহামারীর কালো ছোবলে বিভিন্ন সময় উজার হয়েছে গ্রাম থেকে শহর। সমাজের দর্পণরূপী সাহিত্যে মহামারীর ভয়ঙ্কর প্রভাব এবং মানুষের অসহায়তার ছবি উঠে এসেছে সময়ে সময়ে। নিজেদের সমকালে মহামারীর প্রভাব লেখকদেরও নজর এড়ায় নি। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শরৎচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ সকলের লেখাতেই রোগ-ব্যাধি-মড়ক-মহামারী প্রসঙ্গ দেখতে পাওয়া যায়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনকালের নানা পর্যায়ে প্লেগ, গুটিবসন্ত, ম্যালেরিয়া, কলেরার মতো প্রাণঘাতী রোগের ভয়ানক প্রভাব স্বচক্ষে দেখেছেন। তাঁর সাহিত্যকর্মে এসবের জীবন্ত চিত্র ফুটে উঠেছে। নিজের চোখের সামনে কত জরা, কত মৃত্যু ঘটতে দেখেছেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিশুকন্যা প্লেগে মারা যায়। রবীন্দ্রপুত্র শমীন্দ্রনাথকে কেড়ে নেয় কলেরা। একদিকে রোগ-ব্যাধি-মহামারীর ফলে স্বজনবিচ্ছেদের যন্ত্রণা অপরদিকে সাধারণ মানুষের জীবনযন্ত্রণা — তাঁর কবিতা-ছোটগল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-সহ নানা সাহিত্যকর্মে উঠে এসেছে।

সূচক শব্দ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যকর্ম, মহামারী, কোয়ারেন্টাইন, করোনা, প্রাণঘাতী রোগ, চিকিৎসা, অভাব, লকডাউন, আক্রান্ত, ভয়, পাঁচন, স্বজন-বিচ্ছেদ

১

রোগ-ব্যাধি-মড়ক-মহামারী-বন্যা-ঝড়-দুর্যোগ প্রভৃতি মানুষের চলার পথের নিত্য সঙ্গী। এগুলি সময় বিশেষে ব্যাপক আকার ধারণ করে মানবসভ্যতার অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে, থামিয়ে দিয়েছে তার অগ্রগতির যাত্রাকে। ভারতে বিভিন্ন সময় কলেরা, বসন্ত, ফ্লু, ডেঙ্গু, প্লেগ, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মহামারী তার ভয়ানক রূপ নিয়ে হাজির হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে করোনা ভাইরাস বা কোভিড মহামারীর প্রভাবে এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে ভারত-সহ সমগ্র বিশ্ব। তবে নানা অসুবিধা সত্ত্বেও মানুষ দমে যায়নি, থামেনি তার এগিয়ে চলা। অতীতে আমাদের দেশে 'মহামারী' পরিচিত ছিল 'মড়ক' নামে। 'মহামারী' শব্দের আভিধানিক অর্থ — **"কোনো ছোঁয়াচে রোগে বহু লোকের মৃত্যু, মড়ক।"**[১] বা **"মড়ক, যে সংক্রামক রোগে বহু লোক মরে।"**[২] বা **"মহাকালী ; অতিশয় মড়ক।"**[৩] মড়ক, মারী, অতিমারী, মহামারী, বৈশ্বিক মহামারী অনেক নামের ছদ্মবেশে এইসব ভয়ঙ্কর সংক্রমণ বারবার আক্রমণ করেছে মানব সভ্যতাকে। **" 'মারি' বা 'মরক' শব্দটি নতুন নয়। তার সঙ্গে বিভিন্ন উপসর্গ যোগ করে 'অতিমারি', 'মহামারি', 'মহামারী' প্রভৃতি শব্দ তৈরি হয়েছে। 'অতি' ও 'মহা' উপসর্গ দুটির মধ্যে বড় একটা ফারাক নেই। 'মরক' বা 'মড়ক' শব্দের ধাতু হল 'মৃ' যার অর্থ মরণ। মড়কের কথা বিষ্ণুপুরাণে আছে, আছে বৃহৎসংহিতায়। মহাকাব্যেও এর নানা বর্ণনা পাওয়া যায়।... অভিধানে অতিমারি বা মহামারি বোঝাতে আর একটি শব্দের ব্যবহার আছে, সেটি হলো 'মহামার'। বিধাতার মহামার কিনা তা জানা নেই, তবে তার অর্থ হল মহা দৌরাত্ম্যকারী।... 'মহামারী' শব্দের তিনটি অর্থ বলেছেন হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষে। এক, মহা মারাত্মক রোগ, সংক্রামক রোগ। দুই, অতিশয় মরক এবং তিন, কালী।"**[৪] বাংলা সাহিত্যে রোগ-ব্যাধি-মড়ক-মহামারীর প্রসঙ্গ এসেছে বারে বারে। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে ভারতবর্ষে অনেক কিছুর অভাব ছিল। তবে প্লেগ-কলেরা-যক্ষা-বসন্ত-ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সাক্ষাৎ যমদূতের কোনো অভাব ছিল না। মানুষের হাতে অর্থের অভাব ছিল, খাবারও ঠিক ভাবে জুটত না অনেকের। বিনা চিকিৎসায় মারা যেতেন বহু সংখ্যক মানুষ। মহামারীর আক্রমণে গ্রামের পর গ্রাম উজার হয়েছে। বাদ যায়নি শহরও। অন্যান্য নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতো মহামারীর প্রভাবেও সামাজিক ভারসাম্যতা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পঙ্গু হয়েছে। সাহিত্য বিবেচিত হয় সমাজের দর্পণ হিসেবে। নিজেদের সমকালীন সময়ে মহামারীর প্রভাব চোখ এড়িয়ে যায়নি লেখকদেরও। তাঁরা এই প্রসঙ্গে উদাসীন থাকতেও পারেন নি। তাঁদের লেখায় মহামারীর ভয়ঙ্কর প্রভাব ও সাধারণ মানুষের অসহায়তার চিত্র তুলে ধরেছেন নানাভাবে। বাংলা সাহিত্যে মহামারী প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অরিন্দম ঘোষ

বলেছেন,

> **প্রাক ঔপনিবেশিক প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে এই মহামারিকে 'মড়ক' হিসাবে দেখানো হয়েছে। এই মড়ক থেকে বাঁচার একমাত্র রাস্তা তখন দৈব উপাসনাই ছিল মানুষের অন্তিম ভরসা।**[৫]

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রসঙ্গ আছে। এরই সঙ্গে রয়েছে মারী বা মড়ক প্রসঙ্গ। ১১৭৬ বঙ্গাব্দের মন্বন্তরের সময়ে ক্ষুধাযন্ত্রণার পাশাপাশি সমগ্র বাংলায় কলেরা-বসন্ত মহামারীর রূপ ধারণ করে। লেখকের ভাষায় — ''রোগ সময় পাইল, জ্বর, ওলাওঠা, ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষত বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে। কেহ কাহার চিকিৎসা করে না; কেহ কাহাকে দেখে না; মরিলে কেহ ফেলে না। অতি রমণীয় বপু অট্টালিকার মধ্যে আপনা আপনি পচে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, সে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পালায়।''[৬] মহামারীর এই ভয়ংকর দৃশ্য আমাদের স্তম্ভিত করে।

প্লেগ মহামারীর করালগ্রাসে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চিরদিনের জন্য হারান নিজের প্রথমা স্ত্রী ও শিশু পুত্রকে। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে আমরা দেখতে পাই, ''পরদিন বেলা এগার-বারোটার মধ্যে জাহাজ রেঙ্গুনে পৌঁছিবে; কিন্তু ভোর না হইতেই সমস্ত লোকের মুখেচোখে একটা ভয় ও চাঞ্চল্যের চিহ্ন দেখা দিল। চারিদিক হইতে একটা অস্ফুট শব্দ কানে আসিতে লাগিল, কেরেন্টিন-কেরেন্টিন। খবর লইয়া জানিলাম, কথাটা Quarantine. তখন প্লেগের ভয়ে বর্মা গভর্নমেন্ট অত্যন্ত সাবধান। শহর হইতে আট-দশ মাইল দূরে একটা চড়ায় কাঁটাতারের বেড়া দিয়া খানিকটা স্থান ঘিরিয়া লইয়া অনেকগুলি কুঁড়েঘর তৈয়ারী হইয়াছে; ইহারই মধ্যে ডেকের যাত্রীদের নির্বিচারে নামাইয়া দেওয়া হয়। দশদিন বাস করার পর, তবে ইহারা শহরে প্রবেশ করতে পায়।''[৭] সেই সময়ের বর্মা সরকার যে স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন তা বুঝতে আমাদের খুব একটা অসুবিধা হয়না। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য আমাদের খুব একটা অচেনা নয়। করোনা মহামারীর ফলে আমরা সকলেই **'কোয়ারেন্টাইন'** শব্দটির সঙ্গে সুপরিচিত — '**Quarantine** separates and restricts the movement of people who were exposed to a contagious disease to see if they become sick.'[৮] সেইসঙ্গে 'হোম আইসোলেশন', 'লকডাউন', 'সামাজিক দূরত্ববিধি' প্রভৃতি পরিভাষাগুলিও আমাদের এখন অতি পরিচিত।

বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' (১৯৩৯) উপন্যাসেও মহামারীর ভয়ঙ্কর চেহারা উঠে এসেছে। নায়ক সত্যচরণের মুখে মহামারীর কদর্য রূপের কথা শুনতে পাই। বিভূতিভূষণ আমাদের সঙ্গে শুয়োরমারি বস্তির পরিচয় ঘটিয়েছেন। বস্তিতে কলেরা যখন মহামারীর আকার ধারণ করল তখন কলেরার প্রকোপে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ মারা যাচ্ছিল। কুশী নদীর জলে সবসময় মৃতদেহ ভেসে যাচ্ছিল, দাহ করার কেউ নেই। হাড়হিম করা এই দৃশ্য করোনা মহামারীর সময়েও আমরা টিভিতে ও খবরের কাগজে দেখেছি, পড়েছি, বিস্মিত হয়েছি। তখনকার মতো করোনাকালেও আমরা শবদেহের মিছিল প্রত্যক্ষ করেছি। তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা' (১৯৩৯), 'গণদেবতা' (১৯৪২) প্রভৃতি উপন্যাসে দেখতে পাই কলেরা মহামারীর রূপ নিয়েছে। এছাড়া তাঁর 'আরোগ্য নিকেতন' (১৯৫৩) উপন্যাসেও কলেরা মহামারীর প্রসঙ্গ রয়েছে। এই উপন্যাসে কিছু শিক্ষিত ছেলেদের দেখতে পাই, যারা কলেরার প্রসার ও এর প্রভাবে অনিবার্য মৃত্যুকে আটকাতে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' (১৯৩৬) উপন্যাসে বর্ণিত গাওদিয়া গ্রামে মাঝে মাঝেই বসন্ত, কলেরা, টাইফয়েড-এর মতো রোগগুলি হানা দিত।

বাংলা সাহিত্যের চেনা গণ্ডির বাইরে বিদেশি সাহিত্যিকেরাও তাঁদের রচনায় মহামারীর ভয়াল চিত্র তুলে ধরেছেন। মহামারীর আবহে তাঁরা রচনা করেছেন কালজয়ী ক্লাসিক সাহিত্য। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের 'লাভ ইন দ্য টাইম অফ কলেরা', ওরহাম পামুকের 'নাইটস অফ প্লেগ', হোসে সরমাগোর 'ব্লাইণ্ডনেস', আলবেয়ার কামুর 'প্লেগ', ড্যানিয়েল ডিফোর 'আ জার্নাল অফ দ্য প্লেগ ইয়ার' প্রভৃতি।

২

জীবদ্দশায় কলেরা, ম্যালেরিয়া, গুটি বসন্ত, প্লেগের মতো প্রাণঘাতী বিপর্যয় প্রত্যক্ষ করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর সাহিত্যকর্মে এসব মহামারীর জীবন্ত চিত্র ফুটে উঠেছে। কত জরা, কত মৃত্যু, কত বিচ্ছেদ তিনি নিজের চোখে দেখেছেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নয়-দশ বছরের শিশু কন্যার মৃত্যু হয়েছিল প্লেগে। রবীন্দ্রপুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় কলেরায়। স্বজনবিচ্ছেদের প্রতিফলন তাঁর সাহিত্যকর্মে খুব স্বাভাবিকভাবে ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথের 'অভিসার' কবিতায় বসন্তের প্রসঙ্গ রয়েছে। রাজনর্তকী বাসবদত্তা গুটি বসন্তে আক্রান্ত হয়েছিল —

"নিদারুণ রোগে **মারীগুটিকায়** ভরে গেছে তার অঙ্গ।"[৯] সন্ন্যাসী উপগুপ্তের অক্লান্ত সেবায় কোনোমতে তিনি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান। 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতায় পুরাতন ভৃত্য কেষ্টা গুটি বসন্তে আক্রান্ত মনিবকে দিনরাত সেবা করে সুস্থ করে তোলে। মনিবকে সুস্থ করার পর সে নিজে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে ডেঙ্গু মহামারীর উল্লেখ দেখতে পাই। মহামারীর প্রকোপ থেকে বাঁচবার জন্য লেখকের পরিবার অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করে — "একবার কলিকাতায় ডেঙ্গুজ্বরের তাড়ায় আমাদের বৃহৎ পরিবারের কিয়দংশ পেনেটিতে ছাতুবাবুদের বাগানে আশ্রয় লইল। আমরা তাহার মধ্যে ছিলাম।"[১০] অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখাতেও দেখতে পাই, "তারপর কলকাতায় **প্লেগ** এল, ভূমিকম্প এল। তেতলা বাড়ি ছেড়ে গেলুম চৌরঙ্গীতে।"[১১] বর্তমান সময়ে আমরা যে 'হোম আইসোলেশন' শব্দটির সঙ্গে সুপরিচিত, তারই ছাপ যেন এখানে দেখতে পাই।

রবীন্দ্রসাহিত্যে বিশেষত রবীন্দ্র-উপন্যাস ও ছোটগল্পে ম্যালেরিয়া, কলেরা, ডেঙ্গু, গুটি বসন্ত, প্লেগ-সহ নানা ব্যাধি ও মহামারীর উল্লেখ রয়েছে।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে দেখি, মানুষ হাসপাতালে যাওয়ার ভয়ে নিজের রোগ লুকিয়ে রাখার জন্য ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে না, "পাড়ায় প্লেগ দেখা দিল। পাছে হাসপাতালে ধরিয়া লইয়া যায় এজন্য লোকে ডাক্তার ডাকিতে চাহিল না।"[১২] একই দৃশ্য আমরা করোনা মহামারীর সময়েও দেখেছি। এই উপন্যাসে আরও দেখতে পাই, "যে বছর কলিকাতা শহরে প্রথম প্লেগ দেখা দিল তখন প্লেগের চেয়ে তার রাজতকমা-পরা চাপরাসির ভয়ে লোকে ব্যস্ত হইয়াছিল। শচীশের বাপ হরিমোহন ভাবিলেন, তাঁর প্রতিবেশী চামারগুলোকে সকলের আগে প্লেগে ধরিবে, সেইসঙ্গে তাঁরও গুষ্টিশুদ্ধ সহমরণ নিশ্চিত।"[১৩] করোনা মহামারীকালে আমরা যে 'গোষ্ঠীসংক্রমণ'-এর কথা শুনেছি এবং তা রোধ করার জন্য সামাজিক দূরত্ববিধি মেনে চলার পরামর্শ প্রশাসনের তরফ থেকে সাধারণ মানুষকে দেওয়া হয়েছিল; কোথাও যেন 'গুষ্টিসুদ্ধ সহমরণ'-এ তারই ছায়া দেখতে পাওয়া যায়। যে কথা এই শতাব্দীর মহামারী প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে, তা রবীন্দ্ররচনায় অনেক আগেই উদ্ভাসিত হয়েছে। তাঁর দূরদর্শিতা আমাদের বিস্মিত করে। করোনার প্রকোপে অসংখ্য মানুষ অসুস্থ হওয়ায় বেডের অভাব পূরণ করার জন্য অনেক জায়গায় আপদকালীন তৎপরতায় অস্থায়ী হাসপাতাল গড়ে তোলা হয়। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসেও দেখতে পাই, জগমোহন প্লেগের হাত থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য নিজের বাড়িতে হাসপাতাল বসিয়েছেন — **"জগমোহন স্বয়ং প্লেগ-হাসপাতাল দেখিয়া আসিয়া বলিলেন, ব্যামো হইয়াছে বলিয়া তো মানুষ অপরাধ করে নাই। তিনি চেষ্টা করিয়া নিজের বাড়িতে প্রাইভেট হাসপাতাল বসাইলেন... আমাদের হাসপাতালে প্রথম রোগী জুটিল একজন মুসলমান, সে মরিল। দ্বিতীয় রোগী স্বয়ং জগমোহন, তিনিও বাঁচিলেন না।"**[১৪] এই প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিকের মন্তব্য, "জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে জগমোহন যাকে সত্য বলে জেনেছেন, তারই জন্য তাঁর আত্মদান কতো সম্মানিত মৃত্যুর নিদর্শন। প্লেগের অত্যাচারে যখন কলকাতার মানুষ দিশাহারা তখন স্বল্প সামর্থ্যে সাময়িক হাসপাতাল খুলে উদ্বুদ্ধ যুবকদের নিয়ে অসহায় ইতরজনের সেবায় নেমে পড়া তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কৃতির নিদর্শন।"[১৫]

'গোরা' উপন্যাসে গোরা বিভিন্ন গ্রাম ঘোরার সময় মহামারী, দুর্ভিক্ষের সঙ্গে পরিচিত হয়। মানুষের হাহাকার তাকে বিচলিত করে। হরিমোহিনীর বয়ানে মহামারীর ভয়ঙ্কর চিত্র উঠে এসেছে। নানা দুঃখভোগের পর যখন সংসারে হরিমোহিনীর একটু কদর বেড়েছিল, তখনই তার জীবনে স্বজনবিয়োগের অসহ্য আঘাত নেমে আসে। তার নিজের কথায়, **"কলেরা হইয়া চারিদিনের ব্যবধানে আমার ছেলে এবং স্বামী মারা গেলেন। যে দুঃখ কল্পনা করিলেও অসহ্য বোধ হয় তাহাও যে মানুষের সয়, ইহাই জানাইবার জন্য ঈশ্বর আমাকে বাঁচাইয়া রাখিলেন।"**[১৬] লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখের যে অনুভূতিগুলো মনের গভীরে চাপা ছিল, তাই যেন কলমের স্পর্শে প্রাণ পেয়েছে। সন্তান হারানোর মতো অসহ্য ব্যথাও তিনি সহ্য করেছিলেন, মহামারীই কেড়েছিল লেখকপুত্র শমীন্দ্রনাথকে।

'দিদি' গল্পে ওলাওঠার প্রসঙ্গ রয়েছে। গ্রাম্যবধূ শশীকলা ওলাওঠা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে বলে পাড়ায় খবর হয় — "... একদিন প্রাতঃকালে গ্রামবাসীগণ সংবাদ পাইল যে, রাত্রে শশী **ওলাওঠা** রোগে আক্রান্ত হইয়া মরিয়াছে এবং রাত্রেই তাহার দাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেছে।"[১৭] 'দুর্বুদ্ধি' গল্পে দেখতে পাই, এক পাড়াগেঁয়ে নেটিভ ডাক্তারের কন্যা শশী **ওলাওঠায়** আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে, "গায়ে-হলুদের দিনে রাত তিনটার সময় হঠাৎ শশীকে ওলাওঠায় ধরল। রোগ উত্তরোত্তর কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল...পরদিন দশটা-বেলায় গায়ে হলুদের হরিদ্রাচিহ্ন লইয়া শশী ইহ সংসার হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিল।"[১৮] 'দৃষ্টিদান' গল্পেও ওলাওঠার প্রসঙ্গ রয়েছে। গল্পের কথক কুমু চোখে দেখার ক্ষমতা হারানোর পর স্বামীর কর্মসূত্রে এক গ্রামে থাকার সময় কানে শোনে, তার স্বামীকে এক মুসলমান বৃদ্ধ নিজের পৌত্রীর চিকিৎসা করার জন্য ডাকছে। কুমুর কথায়, "সেদিন সকালে একটি বৃদ্ধ মুসলমান তাহার পৌত্রীর **ওলাওঠার** চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ডাকিতে আসিয়াছিল।"[১৯]

'পোস্টমাস্টার' গল্পের মুখ্য চরিত্র পোস্টমাস্টার জ্বরে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী হয়ে থাকেন। রোগের ফলে তার শরীর ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে যায়। রোগের বর্ণনা থেকে একথা বোঝা খুব কঠিন নয় যে, তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। 'মধ্যবর্তিনী' গল্পে নিবারণের স্ত্রী হরসুন্দরীর জ্বর হলে ডাক্তার তাকে কুইনাইন খেতে দেন — "ইতিমধ্যে ফাল্গুন মাসে হরসুন্দরীর সংকট পীড়া উপস্থিত হইল। জ্বর আর কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। ডাক্তার যতই কুইনাইন দেয় বাধাপ্রাপ্ত প্রবল স্রোতের ন্যায় জ্বরও তত ঊর্ধে চড়িতে থাকে।"[২০] ওষুধ সত্ত্বেও জ্বরের মাত্রা কিছুতেই কমে না। ওষুধের নাম থেকে বোঝা যায় হরসুন্দরীর ম্যালেরিয়া হয়েছিল। 'ভাইফোঁটা' গল্পে ম্যালেরিয়া জ্বরের উল্লেখ রয়েছে। গল্পের এক চরিত্র অনু বারবার ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয় — "স্বামীর সঙ্গে মফঃস্বলে ফিরিবার সময় বার বার **ম্যালেরিয়া** জ্বরে পড়িয়া অনুর এখন এমন দশা যে ডাক্তাররা ভয় করিতেছে, তাঁকে ক্ষয়রোগে ধরিয়াছে।"[২১] শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু হয়। 'মাল্যদান' গল্পেও মহামারীর প্রসঙ্গ আছে। প্লেগের ভয়ে মানুষ নিজের স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র পলায়ন করেছে, নতুন জায়গায় বসবাস শুরু করেছে। পটলের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট স্বামী প্লেগের ভয়ে কলকাতায় বাস না করে অন্য জায়গায় বসবাস করছিলেন, "পটলের স্বামী হরকুমারবাবু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বেহার-অঞ্চল হইতে বদলি হইয়া কলিকাতার আবগারি-বিভাগে স্থান পাইয়াছেন। **প্লেগের** ভয়ে বালিতে একটি বাগানবাড়ি ভাড়া লইয়া থাকেন, সেখান হইতে কলিকাতায় যাতায়াত করেন।"[২২]

'দেশনায়ক' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্লেগ-ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মহামারীর ভয়াবহ রূপ ও তার বিস্তার নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। তাঁর মন্তব্য, **"যাহাকে বলে বিনাশ, যাহাকে বলে বিলোপ, তাহা নানা বেশ ধারণ করিয়া এই পুরাতন জাতির আবাসস্থলে আসিয়া দেখা দিয়াছে। ম্যালেরিয়ায় শতসহস্র লোক মরিতেছে এবং যাহারা মরিতেছে না তাহারা জীবন্মৃত হইয়া পৃথিবীর ভার বৃদ্ধি করিতেছে। এই ম্যালেরিয়া পূর্ব হইতে পশ্চিমে, প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। প্লেগ এক রাত্রির অতিথির মতো আসিল; তার পড়ে বৎসরের পর বৎসর যায়, আজও তাহার নররক্ত পিপাসার নিবৃত্তি হইল না।"**[২৩] এই প্রবন্ধে তিনি আরও বলেছেন — "এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, ম্যালেরিয়া-প্লেগ-দুর্ভিক্ষ কেবল উপলক্ষ্যমাত্র, তাহারা বাহ্যলক্ষণমাত্র — মূল ব্যাধি দেশের মজ্জার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।"[২৪] 'ওলাওঠার বিস্তার' নামক প্রবন্ধে ভারত-সহ বিশ্বের নানা দেশে ওলাওঠা বা কলেরার বিস্তার নিয়ে লেখক আলোচনা করেছেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, **"ভারতবর্ষ যে ওলাওঠা রোগের জন্মভূমি এ সম্বন্ধে সন্দেহ অতি অল্পই আছে। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে এই ভীষণ মড়ক বঙ্গদেশ হইতে দিগ্বিজয় করিতে বাহির হইয়া সিন্ধু, ইউফ্রাটিস, নীল, দানিয়ুব, ভল্গা অবশেষে আমেরিকার সেন্ট লরেন্স এবং মিসিসিপি নদী পার হইয়া দেশবিদেশ উত্থিত করিয়াছিল।"**[২৫]

রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি দূর করার জন্য নানা কর্মসূচি নিয়েছিলেন। ১৯১১ সালে কলকাতা-সহ নানা জায়গায় প্লেগ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছিল। চিকিৎসার অভাবে প্রাণ হারাচ্ছিলেন বহু মানুষ। এই সময় অসহায় আর্ত মানুষের সহায়তা করার অভিপ্রায়ে প্লেগের হাসপাতাল তৈরি করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই উদ্যোগে তাঁর সহযোগী ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভগিনী নিবেদিতা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'জোড়াসাঁকোর ধারে' গ্রন্থে লিখেছেন, **"সেই সময়ে কলকাতায় লাগল প্লেগ। চার দিকে মহামারী চলছে, ঘরে ঘরে লোক মরে শেষ হয়ে যাচ্ছে। রবিকাকা এবং আমরা এ বাড়ির সবাই মিলে চাঁদা তুলে প্লেগ হাসপাতাল খুলেছি, চুন বিলি করছি। রবিকাকা ও সিস্টার নিবেদিতা পাড়ায় পাড়ায় ইনসপেকশনে যেতেন। নার্স ডাক্তার সব রাখা হয়েছিল।"**[২৬] এই প্লেগেই অবন ঠাকুরের ছোট্টো শিশুকন্যা মারা যায়। তাঁর নিজের কথায়, "হবি তো হ, সেই প্লেগ এসে ঢুকল আমারই ঘরে। আমার ছোট্ট মেয়েটিকে নিয়ে গেল। ফুলের মতন মেয়েটি ছিল বড়ো আদরের।"[২৭] প্লেগের পাশাপাশি কলেরা, ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো মহামারীতেও রবীন্দ্রনাথ সমভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ১৯১৫ সালে বাংলায় কলেরা তার ভয়াবহ রূপ নিয়ে হাজির হয়। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িও এর করালগ্রাসের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। স্বয়ং রবীন্দ্রপুত্র শমীন্দ্রনাথ কলেরায় মারা যায়। এর প্রভাবও তাঁর লেখায় পড়েছিল। এর পরবর্তী সময়ে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর আকার ধারণ করলে পূর্ব অভিজ্ঞতার কারণে সতর্ক রবীন্দ্রনাথ কবিরাজের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। সেই সময় ইনফ্লুয়েঞ্জা 'যুদ্ধজ্বর' নামে পরিচিত হয়েছিল। বহু জায়গায় মহামারী ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর স্বপ্নের শান্তিনিকেতনে এই ফ্লু যাতে মহামারীর রূপ নিয়ে ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য তিনি প্রত্যেককে **'পঞ্চতিক্ত পাঁচন'** খাইয়েছিলেন। তেউরি, নিম, গুলঞ্চ, নিশিন্দা, থানকুনি বেটে একসঙ্গে মিলিয়ে এই পাঁচন তৈরি হয়েছিল। এই পাঁচন রবীন্দ্রনাথ সকল আশ্রমবাসীদের খাওয়াতেন এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো মহামারী অনেকটাই প্রতিরোধ করতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে এই 'পঞ্চতিক্তপাঁচন'-এর কথা পাওয়া যায়। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর ছিল গভীর হৃদ্যতা। জগদীশচন্দ্রকে লেখা একটি চিঠিতে এই পাঁচনের কথা জানিয়েছেন, **"... বৌমার খুব কঠিন ন্যুমোনিয়া হয়েছিল। অনেকদিন লড়াই ক'রে কাল থেকে ভাল বোধ হচ্চে। সম্পূর্ণ সুস্থ হতে বোধহয় অনেকদিন লাগবে। হেমলতা এবং সুকেশী এখনো ভুগচেন। তার মধ্যে হেমলতা প্রায় সেরে উঠেচেন — কিন্তু সুকেশীর জন্যে ভাবনার কারণ আছে। কিন্তু ছেলেদের মধ্যে একটিরও**

ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়নি। আমার বিশ্বাস, তার কারণ, আমি ওদের বরাবর পঞ্চতিক্ত পাঁচন খাইয়ে আসচি। ছেলেদের অনেকেই ছুটীর মধ্যে বাড়ীতে নিজেরা ভুগেছে এবং সংক্রামকের আড্ডা থেকে এবং কেউ কেউ মৃত্যুশয্যা থেকে এসেচে। ভয় ছিল, তারা এখানে এসে রোগ ছড়াবে — কিন্তু একটুও সে লক্ষণ ঘটেনি, এবং সাধারণ জ্বরও এ বছর অনেক কম। আমার এখানে প্রায় দুশো লোক, অথচ হাঁসপাতাল প্রায়ই শূন্য প'ড়ে আছে — এমন কখনও হয়না — তাই মনে ভাবচি এটা নিশ্চয়ই পাঁচনের গুণে হয়েচে।"[২৮]

করোনার সময়েও অনেক চিকিৎসক এই অজানা মহামারীর মোকাবিলা করার জন্য লবঙ্গ, দারচিনি, গোলমরিচ, মধু, তুলসীপাতা প্রভৃতি একসঙ্গে মিশিয়ে ক্বাথ তৈরি করে খাওয়ার কথা বলেছিলেন। মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও তাদের স্বাবলম্বী করার ভাবনা থেকে রবীন্দ্রনাথ পল্লী উন্নয়নের কাজে এগিয়েছিলেন। তাঁর পল্লী উন্নয়ন চিন্তা সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের মন্তব্য এখানে স্মর্তব্য, **"সমগ্র দেশের ভার তাঁর একার কাঁধে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তবে, কয়েকটি গ্রামের ভার নিতে পেরেছিলেন। আমরা দেখেছি সেই উন্নয়ন প্রচেষ্টা তিনি কীভাবে সবার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। ম্যালেরিয়ার পীঠস্থান — মজা ডোবা, বুজে আসা পুকুর পুনরুদ্ধার করালেন। জঙ্গল পরিষ্কার করা হতে থাকল। পানীয় জলের সুব্যবস্থার জন্যে কূপ খননের ব্যবস্থাও করা হল।"**[২৯] এই ভাবনার মধ্যেও যে মানুষকে প্লেগ, কলেরা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মহামারী থেকে দূর করার পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথের মনে কাজ করছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। করোনা মহামারীকালে সামাজিক জীব মানুষকে নিজেদের প্রয়োজন ও সুরক্ষার জন্য সামাজিক দূরত্ববিধি-সহ আরও নানা নিয়ম মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল সরকারের তরফ থেকে।

মহামারী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নানা সতর্কবাণী বর্তমান সময়েও সমান প্রাসঙ্গিক। করোনা মহামারীর সময়ে রবীন্দ্রনাথের গান, তাঁর লেখা অনেকে থেরাপির মতো ব্যবহার করেছেন এবং সুফল পেয়েছেন। সবশেষে বলতে পারি সমসাময়িককালে রোগ-ব্যাধি-মারী-মড়ক প্রভৃতির ফলে হওয়া সাধারণ মানুষের জীবনযন্ত্রণা, নিজের ব্যক্তিগত জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতার কথা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে তাঁর ছোটগল্প-কবিতা-উপন্যাস-প্রবন্ধ-সহ নানা সাহিত্যকর্মে উঠে এসেছে।

তথ্য সূত্র :

১। 'সংসদ কিশোর বাংলা অভিধান', শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০০৩, ষষ্ঠ মুদ্রণ : জুলাই ২০১৬, পৃ. ৬৬৮

২। 'চলন্তিকা আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান', রাজশেখর বসু (সংকলিত), নতুন সংস্করণ ১৪১৬, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৫৮১

৩। 'সংস্কৃত বাংলা অভিধান', শ্রীঅশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবলরাম প্রকাশনী, ১০১বি বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা ৭০০০০৬, পৃ. ৩২৩

৪। https://sahomon.com/welcome/singlepost/epidemic-pandemic-etymological-mythological-relationship

৫। 'শিল্প ও সাহিত্যে মহামারি ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা', অরিন্দম ঘোষ, উত্তর সম্পাদকীয় বিভাগ, সুখবর, ২৪ ডিসেম্বর ২০২১, বর্ষ ১৭, সংখ্যা ৬৯, সম্পাদক শমীক স্বপন ঘোষ, ১২/৩/৪ জামির লেন, কলকাতা ৭০০০১৯, পৃ. ৬

৬। 'আনন্দমঠ', বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম রচনাবলী (উপন্যাস সমগ্র), শুভম, ৭ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ ১ জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৭৩৬-৭৩৭

৭। 'শ্রীকান্ত' (অখণ্ড), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইউনাইটেড পাবলিশার্স, ৭৭/এ পটলডাঙা স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ ১ বৈশাখ ১৪০৫,পৃ. ১০৫

৮। https://www.cdc.gov/quarantine/index.html

৯। 'অভিসার', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৩৮ পৌষ, পুনর্মুদ্রণ ১৩৬২ আশ্বিন, পৃ. ৩৪৩

১০। 'জীবনস্মৃতি', রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০০১৭, বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪২২, পৃ. ৪২৬

১১। 'জোড়াসাঁকোর ধারে', অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০০১৭, প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১৩৫১, সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৩৭৮, পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৪১৮, পৃ.৮৪ (অতঃপর এটি 'জোড়াসাঁকোর ধারে' নামে উল্লিখিত)

১২। 'চতুরঙ্গ', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলকাতা, প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৩২২ বৈশাখ, পুনর্মুদ্রণ ১৩৫৯ শ্রাবণ, পৃ. ৩২

১৩। ওই, পৃ. ৩১
১৪। ওই, পৃ. ৩২
১৫। 'উপন্যাসে সমাজদৃষ্টি : বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ', জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, আর্য ম্যানসন, নবম তল, ৬-এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা ৭০০০১৩, প্রকাশকাল নভেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২৫৯
১৬। 'গোরা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০০১৭, প্রথম সংস্করণ ১৩১৬, সংশোধিত পুনর্মুদ্রণ ভাদ্র ১৪১৭, পৃ. ২৪৭
১৭। 'দিদি', গল্পগুচ্ছ (অখণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০০১৭, শ্রাবণ ১৪১০, পৃ. ২৪৬
১৮। ওই, পৃ. ৩৬৫-৩৬৬
১৯। ওই, পৃ. ৩৫১
২০। ওই, পৃ. ১৩৯
২১। ওই, পৃ. ৫৮২
২২। ওই, পৃ. ৪২৯
২৩। 'দেশনায়ক', সমূহ, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, সার্ধশতবর্ষ সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০০২০, প্রকাশ ২২ শ্রাবণ, ৭ অগস্ট ২০১৬, পৃ. ৫১৫
২৪। ওই, পৃ. ৫১৫
২৫। Sanbad.net.bd/literature/samoeky/34336
২৬। 'জোড়াসাঁকোর ধারে', পৃ. ১৬০
২৭। ওই, পৃ. ১৬০
২৮। রবীন্দ্র-ভাবনায় জনস্বাস্থ্য - কালি ও কলম kaliokalam.com)
২৯। 'পল্লী উন্নয়ন ও রবীন্দ্রনাথ', ভূপেন মল্লিক, নবপত্রিকা, একদিন, ৩ জানুআরি ২০১৬, ১৮ পৌষ ১৪২২, রবিবার, পৃ. ৬

লেখক পরিচিতি :

সায়ন্তন মণ্ডল : বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের বৃত্তিভোগী গবেষক। সাহিত্য বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন। কলকাতা বইমেলা ২০২৪এ প্রকাশিত গ্রন্থ 'রামধনু পত্রিকায় প্রকাশিত কুমুদরঞ্জন মল্লিকের নির্বাচিত কবিতা'।